এলাইজা

একটি অর্থহীন কাহিনি

লুৎফুল কায়সার

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

২০১৫ সালের দিকে ইন্টারনেটে এলাইজা নামের একটা ক্রিপিপাস্তা এসেছিল, পরে হুট করেই উধাও হয়ে যায়। অনেক খুঁজেও পরে আর পাইনি। তখন এই বইটার প্লট মাথায় আসে।

পুরো কাহিনি একদমই অগোছালো, হুট করেই শুরু এবং হুট করেই শেষ। মাঝখানে বিরক্তিকর ভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যাপার-স্যাপার উল্লেখ করা হয়েছে যার সাথে শেষে হয়তো বইটার মূল কাহিনির কোনো সংযোগ পাবেন না। এমনকি বইটির নামকরণও যথার্থ হয়নি। সব মিলিয়ে বইটা একেবারেই ভালো না, অর্থহীন একটা কাহিনি। পুরো কাহিনিটিই বর্ণিত হয়েছে একজন খারাপ ছাত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে, তাই তার চিন্তাধারাতে অজস্র ভুল থাকতে পারে।

যারা ভালো বই পড়তে চান তারা দয়া করে এটি এড়িয়ে চলুন।

লুৎফুল কায়সার

পূর্বকথা

গভীর রাত।

ইমেইলটা চলে গেল। বন্ধুর প্রতি সম্ভবত এটাই তাঁর শেষ বার্তা।

ল্যাপটপটা বন্ধ করলেন ডা. জেফ। যে অদ্ভুত তথ্যগুলো তিনি নিজের বন্ধুকে জানালেন সেগুলো ভবিষ্যতে কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তার পরেও, এগুলো জানানোর দরকার ছিল।

ওনার বন্ধু এগুলো কি কোনোদিন প্রকাশ করবে? হয়তো করবে। অনেকেই জানবে। কেউ শুধু বিনোদন পাবে, কেউ মজা নেবে আবার কেউ হয়তো বিশ্বাসও করতে পারে। তবে খুব কম মানুষই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে।

সত্য জিনিসটা আসলে এমনই। সবাই সহ্য করতে পারে না।

জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। অন্ধকার একটা আকাশ। যেন পৃথিবীর সব শুভ শক্তিগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। চিরকাল মানুষ অসংখ্য কল্পকাহিনি লিখেছে, সেগুলোতে শুভ শক্তিগুলোর বিজয় দেখিয়েছে। কিন্তু তারা জানে না আসল সত্য। তারা আসলে শুভ আর অশুভের পার্থক্যই বোঝে না। বোঝার কোনো দরকারও নেই।

মনে মনে হাসলেন তিনি। যে ছায়ার জগৎকে মানুষ সত্য ভাবছে তা আসলে সত্য নয়। সত্য বড়োই ভয়াবহ আর নির্মম। হয়তো একদিন মানুষ জানবে সেই সত্যের কথা, কিংবা হয়তো কখনোই জানবে না!

কে জানে?

আকাশটা বদলে যাচ্ছে, সব কিছু কেমন যেন সবুজাভ হয়ে যাচ্ছে।

"আর না, অনেক হয়েছে," শব্দ করে হেসে উঠলেন তিনি। ওনার ফ্লাটের জানালাটা বেশ বড়ো। একজন মানুষের বের হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

উঁকি দিলেন, আঠারোতলা থেকে নিচের প্রায় ফাঁকা রাস্তাটাকে কেমন যেন অপার্থিব লাগছে। এই পৃথিবী, এখানকার সম্পর্কগুলো... সব কিছু কেবলই মায়া?

"জীবন নিয়েই মাটির পৃথিবী জীবন্ত," হাসলেন উনি।

একটি ক্রিপিপাস্তা

একটা গম্ভীর খসখসে কণ্ঠ কেমন যেন ভাবলেশহীনভাবে বলে যাচ্ছে— "এখন আমরা শুনব ক্রিপিপাস্তা 'এলাইজা'।

১৯৯৭ সালের ১২ই ডিসেম্বরে আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়াতে ল্যারি আর ডিক নামের দুই বন্ধু তাদের প্রেমিকা অ্যানা এবং ব্রিজেটকে নিয়ে একটি গাড়িতে করে ঘুরতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়। সাতদিন পর পুলিশ একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ওই চারজনের মস্তকবিহীন মৃতদেহ উদ্ধার করে। ওই বাড়িরই পেছনে একটি ড্রাম থেকে তাদের মাথাগুলো পাওয়া যায়।

মেডিকেল পরীক্ষা শেষে জানা যায় যে তাদের সবাইকে চেইন-স দিয়ে জবাই করা হয়েছে এবং মেয়েদুটির মাথাদুটো বিচ্ছিন্ন করে সেগুলোর সাথে ওরাল সেক্সও করা হয়েছে। গোটা বাড়িতে খুনি বা খুনিদের কোনো আঙুলের ছাপ খুঁজে পায়নি পুলিশ। তবে যে ড্রামে মাথাগুলো রাখা ছিল তার ভিতরে মাথাগুলোর সাথেই একটি কাগজ খুঁজে পাওয়া যায় যাতে কয়েকটি লাইন লেখা ছিল। লাইনগুলো হল :

ইঁদুরের গর্ত দেখতে আমার ভালো লাগে না,
দাঁড়কাকের ডাকও ভালো লাগে না,
এলাইজা, ওই লোকটা যখন তোমার নগ্ন শরীরের ওপর শুয়ে পড়ে,
তখন আমার অনেক কষ্ট হয়।

এই মামলার কোনো সমাধান হয়নি... "

ঠিক এই জায়গাতে এসেই আটকে গেল ভিডিয়োটা আর শুরু হল একটা পেইড অ্যাড।

"সেরা সাবান হ্যাকু সাবান... "

হ্যাকু সাবান? এ আবার কেমন নাম? পাঁচ সেকেন্ড পরেই অ্যাডটা কেটে দিল অভি। আবার সেই ক্রিপিপাস্তাটা শুরু হল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি।

গম্ভীর সেই খসখসে গলা বলে চলল, "কেউ বলে এটা শুধুই একটা গল্প, আবার কেউ বলে এমন একটা ঘটনা আসলেই ঘটেছিল। সত্য যে কী তা কেউ জানে না!"

এখানেই ভিডিয়ো শেষ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল অভি। ক্রিপিপাস্তা হচ্ছে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা ভয়ের গল্প। এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ সত্য বলেও দাবি করে।

'এলাইজা' অনেক বিখ্যাত ক্রিপিপাস্তা।

রাত দেড়টা বাজে। ঘুম আসছে ওর।

১

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। চিড়িয়াখানার সামনের বসে আছে অভি আর অলক। মাটির দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তাতে যেন ডুবে আছে অভি। ক্রমাগত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চলেছে অলক।

শুক্রবার বলে অন্যদিনের তুলনায় ভিড় একটু বেশি। সম্ভবত আধ ঘণ্টা পরেই বন্ধ হয়ে যাবে চিড়িয়াখানা, তাই বেরিয়ে আসা মানুষের সংখ্যাই বেশি। এখানে যতটা না সবাই পশু-পাখি দেখতে আসে, তার চাইতে বেশি আসে প্রেম করতে। তবে ছুটির দিন হওয়াতে আজ প্রেমিক-প্রেমিকা জুটিদের সংখ্যা একেবারেই কম। যারা বেরিয়ে আসছে বেশিরভাগই পরিবার নিয়ে আসা ছাপোষা মানুষ।

"তো ক্যাম্পাসে ফিরে যাবি? এই তোর ইচ্ছা?" চায়ের কাপটা টেবিলে রাখল অলক।

"হ্যাঁ, দোস্ত," ততক্ষণে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে অভি।

"শেষ কবে যেন ক্যাম্পাসে গেছিলি?"

"তাও চোদ্দো-পনেরো মাস আগে।"

"আমার ইমিডিয়েট জুনিয়র ব্যাচও কিন্তু বের হয়ে গেছে... "

"জানি।"

"শেষ যে পাঁচটা পরীক্ষা দিয়েছিলি, ক'টাতে পাশ করেছিলি?"

"একটা।"

"তার পরেই তো ঠিক করেছিলি যে ক্যাম্পাসে আর ব্যাক করবি না। তা এখন হুট করে?"

চুপ করে রইল অভি।

ওকে কথা বলতে না দেখে আবার বলতে লাগল অলক, "দেখ, সিস্টেম কিন্তু তুই জানিস। তোকে নিরুৎসাহিত করছি না। আমারও তো একই সমস্যা। কিন্তু ব্যাচ বের হয়ে যাওয়ার পর থেকেই আমি একদম আঠার মতো লেগে আছি। যে কয়েকটাতে পাশ করতে পেরেছি তা শুধু এ-কারণেই। তুই কিন্তু ব্যাচ থাকতেও অনিয়মিত ছিলি আর এখন তো... "

"নিয়মিত হব, নিয়মিত ছিলাম না বলে যে নিয়মিত হতে পারব না, এমন তো না," অভির কণ্ঠে বিরক্তি।

"দোস্ত, ব্যাপারটা শুধু তা না, তুই প্রায় এক বছরের বেশি অনুপস্থিত। এ-সময়ে কোনো পরীক্ষাতেও বসিসনি। রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অনুযায়ী তুই রি-অ্যাডমিশন পাবি না। আর যদিও পেয়ে যাস তবে সেটা তোদের হেডস্যারের বিশেষ বিবেচনাতে।"

"তো কী করব? ক্যাম্পাসে যাব না? এটাই চাস?"

"না দোস্ত, আমি অবশ্যই চাই তুই গ্রাজুয়েশন শেষ কর। যতদূর জানি ওই কোচিংটা থেকে বেশ ভালোই কামাচ্ছিস। ক্যাম্পাসে নিয়মিত হতে হলে কিন্তু কোচিংটা ছাড়তে হবে তোকে, পারবি?"

"হুম," গম্ভীর হয়ে গেল অভি, "এটা আমি নিজেও ভেবে দেখেছি। ব্যাপারটা আসলেই অনেক কঠিন হয়ে যাবে। চেষ্টা করব দুটাই একসাথে চালিয়ে নেওয়ার।"

"প্রায় অসম্ভব, দোস্ত। এখন শেষ সেমিস্টারে আছে আমার পরের ব্যাচের পরের ব্যাচ। ওদের সাথে রি-অ্যাডমিশন দেবে তোকে। শেষ সেমিস্টারের ক'টা সাবজেক্ট যেন বাকি আছে তোর?"

"প্রায় সব!"

"ওটাই তো! সকাল আটটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ক্লাস করবি ওদের সাথে, মাঝে মাঝে ল্যাব থাকবে। ক্লাস-টেস্ট থাকবে, ল্যাব রিপোর্ট থাকবে। এত কিছু কোচিং সামাল দিয়ে করতে পারবি?"

"হুম," গভীর চিন্তায় ডুবে গেল অভি।

"শোন, যদি ক্যাম্পাসে ফিরেই যেতে চাস, তবে ভালোমতো যা। গেলি, পরীক্ষা দিলি, ফেল করলি! লাভটা কী হল?"

"সেটাই।"

"তা হুট করে ফিরে কেন যাচ্ছিস? গত বছরেই যে বললি ফিরবি না!"

"হুম... শোন, আমার আম্মুর অবস্থা তো জানিসই। উনার হার্টের সমস্যা আর উনি জানেন না যে... "

"তোর গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয়নি?"

"একদম। আব্বু মারা যাওয়ার পর উনি সংসার প্রায় একহাতে সামলেছেন। উনি জানেন আমাদের ব্যাচ বের হয়ে গেছে। নানা জায়গা থেকে উনার কাছে খবর আসে এ অমুক করছে, সে তমুক করছে, ও বিদেশ যাচ্ছে, ওর বিয়ে হচ্ছে। এগুলো নিয়ে মাঝে মাঝেই ডিসটার্বড থাকেন। আমাকে প্রশ্ন করেন যে আমি কেন ঢাকা যাচ্ছি না?"

"তুই কী বলিস?"

"বলি যে কোচিং থেকে মোটামুটি কামিয়ে একটা ক্যাপিটাল করে তার পর একবারে শিফ্‌ট হব।"

"এতে কাজ হয়?"

"এতদিন হয়েছে। তবে এখন আম্মু কেন যেন রেগে যান। তার চেয়েও বড়ো কথা, ক্যাম্পাসে আমার স্টুডেন্টশিপ আছে আর মাত্র আড়াই বছর। এর পর যদি আমি আবার ফিরতে চাই তাহলে... "

"তোকে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের কাছে আবেদন করে স্টুডেন্টশিপের মেয়াদ বাড়াতে হবে।"

"একদম! অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং বছরে একবার কি দু'বার হয়, তা-ও কখন হয় সেটা ঠিক থাকে না। অনেকে তো শুনেছি আবেদন করার ছয়-সাত মাস পরে সম্মতি পেয়েছে।"

"এসব শুনে ভয় পেয়েছিস?"

"তা না, নিশ্চয়ই জানিস দেড় বছর পর আমাদের কনভোকেশন। নিজের শহরে ভার্সিটি হওয়ার এই এক সমস্যা। গোটা দেশ থেকে গ্র্যাজুয়েটরা আসবে। আম্মুও জানবেন... ওই সময়ে যদি আমি কনভোকেশনে যেতে না পারি তবে, আম্মু অনেক কষ্ট পাবেন রে। খারাপ কিছুও হয়ে যেতে পারে!"

"ক'টা সাবজেক্ট যেন বাকি আছে তোর?"

"প্রায় আঠারোটার মতো।"

"দেড় বছরের মধ্যে এত তুলতে পারবি? প্রায় অসম্ভব কিন্তু!"

"আমিও জানি। কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?"

"সেটাই, যা ভালো বুঝিস কর। কাল তাহলে সকাল-সকাল আসছিস?"

"নাহ্, এই ধর ন'টা-সাড়ে ন'টার দিকে।"

"হুম, দরখাস্ত লিখেছিস?"

"না, রাতে লিখব।"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চিড়িয়াখানার ভিতর থেকে মাইকে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে, "চিড়িয়াখানা বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে, দয়া করে আপনারা সবাই বের হয়ে যান।"

আর একটা সিগারেট ধরাল অভি।

"আচ্ছা দোস্ত, অদিতির সাথে কথা হয়?" উঠে দাঁড়াল অলক।

"না, দোস্ত। আর কী কথা হবে? আর যা শুনছি... "

"তোকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, মানুষের শোনা কথা বিশ্বাস করিস না। ইয়ার্কিও তো করতে পারে। সোজাসুজি কথা বল ওর সাথে।"

"কী নিয়ে কথা? কী বলব ওকে?" হাসল অভি।

"বুঝতে পারছি তুই ওসব গুজবে বিশ্বাস করেছিস। কর, করতে থাক। যা-ই হোক, এখানে আর কতক্ষণ আছিস?"

"এই তো, সিগারেটটা শেষ করেই যাব।"

"আমি উঠলাম, টিউশানিতে যেতে হবে।"

কিছুদূর গিয়ে একটা অটোতে উঠে পড়ল অলক।

চুপচাপ আকাশের দিকে চেয়ে রইল অভি। অলক আর ও ছোটোবেলার বন্ধু। একই স্কুল, একই কলেজ, একই ভার্সিটি। সাবজেক্ট অবশ্য আলাদা,

অভি মেকানিক্যাল আর অলক ইলেকট্রিক্যালে। তবে দু'জনের কেউই নিজেদের ভার্সিটি-জীবনে ভালো ফলাফল করতে পারেনি। দু'জনের কপালেই জুটেছে একগাদা ব্যাকলগের বোঝা।

ফলাফল, ওদের ব্যাচ বেরিয়ে যাওয়ার পরেও ওদের থাকতে হয়েছে।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে চার্চ রোডের দিকে হাঁটতে লাগল অভি। সন্ধ্যা সাতটায় কোচিংয়ে একটা ক্লাস নিতে হবে ওকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার পর অদ্ভুত একটা জিনিস খেয়াল করল সে। রাস্তাঘাট ফাঁকা, একেবারেই জনমানুষ নেই। আশেপাশের ভবনগুলোও কেমন যেন নিঃস্তব্ধ লাগছে। এই রাস্তাতে কখনোই খুব একটা ভিড় থাকে না, তবে শুক্রবারে অনেকেই চিড়িয়াখানাতে ঘুরতে আসে। তাই এদিন ভালোই ভিড় দেখা যায়।

কিন্তু আজ কেউই নেই। রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলোও বন্ধ!

ধীরে ধীরে আর একটু এগিয়ে গেল সে। ফাঁকা, সব কিছু ফাঁকা।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল সে। মোরশেদভাইকে একটা কল দেওয়া যেতে পারে। এই সময়ে একদমই কাজ থাকে না তাঁর হাতে। ফাঁকা আর নির্জন রাস্তাগুলোতে হাঁটতে গেলে এক অদ্ভুত মানসিক চাপ অনুভব করে অভি। তাই ফোনে কারও সাথে কথা বলতে বলতে এই রাস্তাগুলো পার দিতে চায় ও।

মোবাইলটা বের করে একটা ছোটোখাটো ধাক্কা খেল সে।

নো নেটওয়ার্ক!

অদ্ভুত ব্যাপার! এমন কেন হল?

মোবাইলের স্ক্রিন থেকে মাথা তুলে আবার চমকে উঠল সে। একের পর মানুষভরতি রিকশা আর অটো চিড়িয়াখানার দিক থেকে চলে যাচ্ছে অপরদিকে। আশেপাশের দোকানগুলোও খোলা। বেশ কিছু মানুষও দেখা যাচ্ছে রাস্তাতে। যানবাহনের আওয়াজে কানপাতা দায়!

মোবাইলের দিকে তাকাল সে। নেটওয়ার্ক ফিরে এসেছে!

হুট করে সব কিছু বদলে গেল কেন? হয়তো কোনো কারণে ওই সময়ে যানবাহনগুলো আটকে ছিল পার্কের সামনে। কিন্তু দোকান আর মানুষ? যে দোকানগুলো কয়েক মুহূর্ত আগেও বন্ধ ছিল সেগুলো খুলল কী করে?

অলৌকিক ব্যাপার নাকি?

একটা রিকশা এসে ওর সামনে থামল।

"মামা, যাবেন নাকি?" হাসল রিকশাওয়ালা।

যাওয়া দরকার ওর। কোচিংয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছে সেখানের ক্লাসগুলো

নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। একটা দরখাস্ত লিখতে হবে, তার পর কাল সকাল-সকালই হাজির হতে হবে ক্যাম্পাসে।

হেডস্যার কী যে বলবেন কে জানে? বুকের ভিতরটা কেমন যেন ধক্ করে উঠল ওর।

"নিউমার্কেট চলেন," রিকশাতে উঠে বসল ও। খুব চিন্তা হচ্ছে, হেডস্যার অনুমতি দেবেন তো? অ্যাকাডেমিক সমস্যা! এই একটা ব্যাপার আপনাকে অন্য যে-কোনো সমস্যা ভুলিয়ে দিতে সক্ষম।

২

রাত পৌনে ন'টা বাজে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে পুরো ক্লাসকে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস বোঝাচ্ছে অভি। পুরো কোচিংয়ে একমাত্র ম্যাথের শিক্ষক সে। এইচ.এস.সি-র কোচিংয়ে ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সায়েন্সের ক্ষেত্রে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি পড়ানোর প্রবণতাই বেশি। ম্যাথ খুব কম মানুষই পড়াতে চায়। সে-কারণে ম্যাথ শিক্ষকের চাহিদা আছে। এই ব্যাপারটাকেই কাজে লাগিয়েছে সে।

মাঝে মাঝে হাসি পায় ওর। মেকানিক্যালে সাধারণত পাঁচটি ম্যাথ কোর্স পড়তে হয়। পাঁচটির মধ্যে তিনটিতেই ফেল করেছে সে। আর সে-ই এখানে জমিয়ে ম্যাথ পড়াচ্ছে।

পুরো সময়টাই ডানপাশে মেয়েরা মনোযোগ দিয়ে শুনে গেছে। প্রশ্নও করেছে কেউ কেউ। নিজেদের মধ্যে গল্প খুবই কম করে ওরা। বিপরীত চিত্র বামে বসা ছেলেদের। অধিকাংশই মাথা নিচু করে মোবাইলে মত্ত, কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, আবার কেউ সামনে বসা সহপাঠীকে বিরক্ত করছে।

বিশেষ করে পিয়াল নামের ছেলেটার জুড়ি নেই। কখনও সামনের জনকে চিমটি কাটছে, কখনও মোবাইল টিপছে আবার কখনও পিছনে ঘুরে কথাও বলছে। অনেকক্ষণ ধরেই ব্যাপারটা খেয়াল করছে অভি, কিন্তু কিছু বলছে না। ক্লাস চলাকালীন সময়ে কাউকেই সে কিছু বলে না।

ক্লাস শেষ করে মোবাইলে সময় দেখল সে। সন্ধ্যাবেলাতে টানা দুটো ক্লাস নিয়ে ফেলেছে সে। চাইলে রাতের স্পেশাল ব্যাচেও ক্লাস নেওয়া যায়। ওই ব্যাচটাতে শুধু সেইসব ছাত্র-ছাত্রীরাই আসে যাদের বাড়ি বা মেস কোচিংয়ের আশেপাশে। ওই ক্লাসটা নেওয়া বা না-নেওয়া ওর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এই ব্যাপারে মোরশেদভাই ওকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছেন।

"আচ্ছা, শোনো," বোর্ডের লেখাগুলো মুছে দিয়ে ক্লাসের দিকে ঘুরল অভি, "কালকে তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম না? একটা প্রবলেম সলভ করতে? কে কে করোনি, দাঁড়াও!"

মেয়েরা সবাই খাতা বের করে ফেলল। ওদিকে ছেলেদের প্রায় অর্ধেকের বেশি দাঁড়িয়ে গেছে। বিরক্ত হল অভি। সহজ একটা সমস্যা ছিল, যে কারও পারার কথা। এই ছেলেগুলো সম্ভবত সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টাই করেনি, কেউ কেউ মনে হয় খাতা খুলেও দেখেনি।

তখনই ওর নজর পড়ল পিয়ালের দিকে। বসে আছে ছেলেটা।

"অ্যাই যে, পিয়াল, খাতা নিয়ে আসো। দেখি কী করেছ," অবাক হয়ে বলল অভি।

চমকে গেল পিয়াল। মাঝেমধ্যেই বাড়ির কাজ দেয় অভি। পরেরদিন জিজ্ঞাসা করে কে কে পারেনি। তার পর কারও খাতা চেক না করেই বোর্ডে সমস্যাটা সমাধান করে দেয়। তাই বাড়ির কাজ না করলেও কোনোদিনই সে দাঁড়ায় না। আজ এমন হবে কে জানত?

"কী হল? খাতা আনো!" খেঁকিয়ে উঠল অভি।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল পিয়াল। তার পর সাদা খাতাটা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল অভির দিকে।

পুরো সাদা একটা খাতা। বাড়ির কাজ তো দূরের কথা, ক্লাসের সমস্যাগুলোও জীবনে খাতাতে তোলেনি ছেলেটা।

"তোমার কি কানে কোনো সমস্যা?" বাঁকা হাসি ফুটে উঠল অভির মুখে।

"না... মানে ভাইয়া... "

"হোমওয়ার্ক করোনি, তাহলে দাঁড়াওনি কেন? কথা কানে যায়নি?"

"ন... না ভাইয়া... "

"ক্লাসে তো খুব মজা কর। মোবাইলে মন, মেয়েদের দিকে বাঁকা চোখে তাকানো, একে ওকে ডিসটার্ব করা! আর পড়াশোনার সময়ে... দাঁড়াও তোমার ব্যবস্থা করছি!"

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল পিয়ালের। অভিভাইয়া যদি এখন ওর আব্বুর নম্বরে ফোন দেন? তবে? কী হবে?

"ভ... ভাইয়া... আমি কাল করে আনব, প্লিজ এবারের মতো ছেড়ে দেন!"

গম্ভীর হয়ে গেল অভির মুখটা। একজন ফাঁকিবাজ ছাত্রের মুখ থেকে বের হওয়া কিছু কথা। ভার্সিটির ক্লাসগুলোতে যখন প্রফেসররা ওকে প্রশ্নের উত্তর না-পারার জন্য বের করে দিতেন তখনও অসংখ্যবার এমন কথা বলেছে সে।

"হুম," মাথা নাড়ল অভি, "কাল আর কী বাড়ির কাজ দেখাবে? আমি থাকলে তো?"

"মানে? ভাইয়া?"

"কিছু না, মন দিয়ে পড়াশোনা করবে ঠিক আছে? প্রবলেমটা কিন্তু একেবারেই সহজ ছিল! যা-ই হোক, ক্লাস, আজকেই তোমাদের সাথে আমার শেষ ক্লাস ছিল। কোচিং ছেড়ে দিচ্ছি, ভালো থেকো সবাই।"

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ক্লাস থেকে বের হয়ে গেল অভি। পুরো ক্লাসে নেমে এল এক অপার্থিব নিঃস্তব্ধতা আর বোর্ডের সামনে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল পিয়াল।

৩

'স্কলারস' কোচিংয়ের অফিসরুম। গম্ভীরমুখে অভির দিকে তাকিয়ে আছেন মোরশেদভাই। পুরো নাম মঞ্জুর হোসেন মোরশেদ। অভিদের ভার্সিটিতেই সিএসইতে পড়তেন। অনেক সিনিয়র। সেকেলে কিছু নিয়ম আর শিক্ষকদের উদ্ভট চিন্তাভাবনাগুলোর সাথে মিলিয়ে চলতে পারেননি। তাই সেকেন্ড ইয়ারের পরেই বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

ততদিনে পুরো শহরে ফিজিক্সের শিক্ষক হিসাবে বেশ নামডাক হয়ে গেছে তাঁর। সেখান থেকেই স্কলারস কোচিংটা খুলে বসা। অক্লান্ত পরিশ্রম করে শহরের অন্যতম সেরা কোচিং বানিয়ে ফেলেছেন এটাকে তিনি। কলেজে থাকার সময়ে এই মোরশেদভাইয়ের কাছেই ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি পড়েছিল অভি, ভার্সিটিতে ঢোকার পর এখানে ম্যাথ পড়ানোর প্রস্তাবটা তিনিই দিয়েছিলেন।

সেই থেকে অভি আছে এখানে।

"ক্লাসে নাকি বলেছিস যে কোচিং ছেড়ে দিচ্ছিস?" হাসলেন মোরশেদভাই।

"হুম, ভাই!"

"দেখ, ছেলেপেলে বেয়াদব, কিন্তু ওদের ওপর রাগ করে... "

"ভাই, আমি আসলেই কোচিং ছেড়ে দিচ্ছি। আর কারও ওপর রাগ আমার নেই।"

"কী!" চমকে গেলেন মোরশেদভাই, "দ্যাখ অভি... এসব কী কথা? বাচ্চা একটা ছেলে, একটা ভুল করেই ফেলেছে, তাই বলে এমন করবি? ওর বাসায় ফোন দেব আমি। চিন্তা করিস না।"

"না, ভাই," হেসে উঠল অভি, "আমি আসলেই ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। একটা ব্যাপার আছে।"

"কী ব্যাপার?"

"ভাই, আমি ক্যাম্পাসে ফিরতে চাচ্ছি!"

'কীহ্! হঠাৎ করে এই চিন্তাভাবনা?"

"ভাবছি গ্র্যাজুয়েশনটা শেষ করব।"

"দেখ অভি, পেমেন্ট নিয়ে তোর কোনো সমস্যা আছে কি? তুই চাইলে ক্লাসপ্রতি একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট তোকে বোনাস দেব।"

"না ভাই, আমি আসলেই ক্যাম্পাসে ফিরতে চাই।"

"তো ফিরে যা, কোচিং কেন ছেড়ে দিচ্ছিস? দুটোই একসাথে চালা!"

"ভাই," কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল অভির কণ্ঠ, "আপনিও তো ওখানকারই ছাত্র ছিলেন। বলেন দেখি এখানে কাজ করে ওখানকার ব্যাকলগগুলো ক্লিয়ার করা সম্ভব? বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে? আমার ব্যাচ যেখানে প্রায় দু'বছর আগে বের হয়ে গেছে!"

"কী বলব বুঝতে পারছি না। তবে যতদূর শুনেছিলাম তুই আর ক্যাম্পাসে ফেরত না-যাওয়ার চিন্তা করেছিলি।"

"হ্যাঁ, ভাই। কিন্তু যাওয়াটা দরকার!"

"হুম, ভালো করে ভেবেছিস তো? শুনেছি নিয়ম-কানুন এখন আরও বাজে হয়েছে। স্যারদের মন-মানসিকতা নিয়ে নতুন করে তো কিছু বলার নেই, সবই জানিস। তোকে কেমন পরিবেশের মুখোমুখি হতে হবে বুঝতেই পারছিস!"

"সব ভেবেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি, ভাই।"

"হুম, তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তার পর একটা ড্রয়ার খুললেন মোরশেদভাই। টাকার একটা বান্ডিল বের করে অভির হাতে দিলেন তিনি।

"সতেরো হাজার আছে, তোর গতমাসের বেতনটা তো বাকি ছিল। ক্যাশে এখন আর টাকা নেই।"

"ভাই, পরে দিয়েন," বান্ডিলটা টেবিলের ওপর রাখল অভি।

"না না, সব কিছু সময়মতো ক্লিয়ার করতে হবে। না হলে পরে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে, নে টাকাগুলো।"

বাধ্য হয়ে টাকাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে রাখল অভি।

"ভাই, আপনি কি রাগ করেছেন?" আমতা আমতা করে বলল সে।

"না না, চল চা খেয়ে আসি।"

"আজ না হয়... "

"চল তো... কাল থেকে তো আর তোকে পাব না।"

***

মোতালেব ভাইয়ের দোকানে চা অর্ডার দিয়ে পাশের কনফেকশনারির দোকানটার দিকে এগিয়ে গেলেন মোরশেদভাই। অভি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো সিগারেট আনতে গেছেন ভাই।

কিছুক্ষণ পর সিগারেট হাতেই ফিরলেন তিনি।

"তোর মোবাইল দেখ তো," অভিকে বললেন উনি।

মোবাইল দেখল অভি, ওর বিকাশ অ্যাকাউন্টে নয় হাজার টাকা এসেছে।

"এসব কী, ভাই?" অবাক হল সে।

"এই মাসে পাঁচদিন ক্লাস নিয়েছিলি আর ওই রাতের বিশেষ ক্লাসগুলোর হিসাব। সব ক্লিয়ার।"

"এত তাড়াতাড়ি এসব দেওয়ার দরকার ছিল না, ভাই। আমাকে তো পর করে দিচ্ছেন।"

"সম্পর্ক সম্পর্কের জায়গায় আর হিসাব হিসাবের জায়গায়। মা-ছেলের সম্পর্কও খারাপ হয়ে যায় আজকাল টাকা জন্য," অভির পিঠ চাপড়ালেন মোরশেদভাই, "আর আমি তো জানি তোর পকেটের অবস্থা।"

"ধন্যবাদ, ভাই," বলার মতো কিছু পাচ্ছিল না অভি।

"শোন, আসলে আমার ভালোই লাগছে যে তুই ক্যাম্পাসে ফেরত যাচ্ছিস। আমারও ইচ্ছা ছিল জানিস, কিন্তু টাকার ধান্দা আর সংসারের বোঝা পিঠে চেপে গেছে, তাই হয়নি। আর শিক্ষক নামের ওই পাষণ্ডদের মুখগুলোর কথা চিন্তা করলেই বমি আসে! যা-ই হোক, জানি না তোর কী হবে। তবে ভালো করে চেষ্টা করিস। জানিসই তো... ওই জায়গাটা একটা নরক... একটা ছোট্ট নরক!"

৪

রাত সাড়ে দশটা মতো বাজে। মহিলা কলেজের রাস্তা পার হয়ে নিউমার্কেটের দিকে এগিয়ে চলেছে অভি। নিউমার্কেট থেকে একটু সামনে এগিয়ে গেলেই বড়োরাস্তা। সেখান থেকে অটো বা রিকশাতে ওঠে ও। প্রতিদিন দশ-পনেরো টাকা বাঁচানোর কৌশল।

আজকে কেন যেন রাস্তাটা পুরোপুরি অচেনা ঠেকছে অভির কাছে। সব কিছু ফাঁকা! আশেপাশে মানুষ তো দূরের কথা, কোনো কুকুরও নজরে পড়ছে না। বাড়িগুলোর দরজা-জানালা সব বন্ধ, যেন ওগুলো সব ফাঁকা। রাস্তার পাশের দোকানগুলোও বন্ধ।

স্ট্রিটলাইটের নিষ্প্রাণ আলো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলাতেও আসার সময়ে দেখেছে যে ওগুলোকে ঘিরে উড়ছে রাজ্যের

পোকা। কিন্তু এখন সেগুলোও নেই। কেউ যেন সব প্রাণের চিহ্ন হুট করেই মুছে ফেলেছে জায়গাটা থেকে। পুরো রাস্তা ফাঁকা, কোনো যানবাহনও নেই।

একটু ভয় ভয় করতে লাগল অভির। রাত সাড়ে দশটার দিকে এই রাস্তা কোনোদিনই এতটা ফাঁকা হয় না। নিউমার্কেট এই এলাকায় হওয়ার কারণে সবসময়ই রাস্তাতে মানুষ থাকে।

আজ শুক্রবার তাই? না, এর আগেও অসংখ্য শুক্রবারে এই এলাকা দিয়ে গেছে ও। কখনও এমন দেখেনি। পকেটে হাত দিল ও, মানিব্যাগে মোরশেদভাইয়ের দেওয়া টাকাগুলো আছে। ফাঁকা রাস্তায় এতগুলো টাকা নিয়ে হাঁটা কি নিরাপদ?

মোবাইলটা বের করল অভি। সন্ধ্যার দিকে ওর আম্মু ফোন দিয়েছিলেন, ধরতে পারেনি। এখন ব্যাক করা যায়।

নো নেটওয়ার্ক!

চমকে উঠল সে। ঠিক সেই বিকালবেলার কথাটা মনে পড়ে গেল। সেই ঘটনা আবার ঘটছে? শরীরে আতঙ্কের একটা হিমস্রোত বয়ে গেল অভির। কী হচ্ছে এসব? কেন হচ্ছে?

এগোতে লাগল সে। ধীরে ধীরে নিউমার্কেটের আরও কাছে এসে পড়ল ও। রাস্তা আগের মতোই নির্জন। হাতের বামে এককালে একটা সিনেমা হল ছিল, বছর দুয়েক আগে ওটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন জায়গাটা ফাঁকা।

এক অপার্থিব নির্জনতা। এমনকি ঝিঁঝিঁপোকার ডাকও শোনা যাচ্ছে না। পুরো প্রকৃতি যেন চুপ করে আছে। ঠিক তখনই ওর নজর গেল হাতের ডানদিকে থাকা একটা স্ট্রিটলাইটের নিচে। পানির মতো কী যেন পড়ে আছে ওখানে।

ওখানে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? কৌতূহল খুব খারাপ জিনিস। স্ট্রিটলাইটের একদম নিচে পৌঁছে গেল সে।

মাটিতে থকথকে তরলের মতো একটা জিনিস বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে, কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসছে ওখান থেকে! কালচে হয়ে গেছে... রক্ত! কোরবানির সময়ে পশু জবাই করলে যেমন করে রাস্তাতে রক্ত পড়ে থাকে ঠিক সেভাবে।

এখানে রক্ত কেন? কেউ গোরু জবাই করেছে? কিন্তু জবাইয়ের সাথে সাথেই তো রক্ত ধুয়ে ফেলা নিয়ম! কেউ না ধুলে সন্ধ্যাবেলা সিটি কর্পোরেশনের লোকেরা এসে ধুয়ে দিয়ে যায়। তাহলে কি সন্ধ্যার পর জবাই করা হয়েছে? কিন্তু আশেপাশে তো কোথাও মাংস বিক্রিও হয় না, তাহলে এখানে কেন কেউ জবাই করবে? তা-ও সন্ধ্যার পর?

মোবাইলের টর্চটা জ্বালিয়ে ভালো করে দেখল অভি। রক্তই!

"অভি! অ্যাই অভি! কী রে, দোস্ত?" ওর কাঁধে কে যেন হাত রাখল।

চমকে গিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল অভি।

"কী রে, মাটিতে কী দেখছিলি? এতবার ডাকলাম!" অবাক কণ্ঠে বলে উঠল অলক। ততক্ষণে অবাক হয়ে এদিক-ওদিকে তাকাতে শুরু করেছে অভি। রাস্তা মানুষে পরিপূর্ণ, ক্রমাগত শোনা যাচ্ছে যানবাহনের হর্ন, দোকানপাটও সব খোলা! এক মুহূর্তে সব বদলে গেল? নিচে তাকাল সে, কিছুই নেই! কোথায় রক্ত?

"কী ভাবছিস, দোস্ত?" বলল অলক, "চল, চা খাই।"

"উম্‌ম্‌, বাসায় যাব," আনমনে বলে উঠল অভি।

"যাস যাস, চা-টা খেয়ে নে।"

***

নিউমার্কেটের সামনে হওয়া নতুন বড়ো চায়ের দোকানটায় দুধ-চা অর্ডার করল অলক। অভির হাতে সিগারেট। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সে। তবে পুরোপুরি না। অলকের বাড়ি এই এলাকাতেই, প্রতিদিন রাতেই চা খেতে বের হয় সে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা এসে গেল।

"কোচিং ছেড়ে দিলাম," সিগারেটটা ফেলে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল অভি।

"তাই? বেশ বেশ, ফুলটাইম ক্যাম্পাস?" হাসল অলক।

"সেটাই ইচ্ছা।"

"আচ্ছা মামা, তখন মাটিতে কী দেখছিলি?"

"কিছু না দোস্ত, মাথাটা ঘুরছিল। আজকাল ব্লাড প্রেশারের সমস্যা দেখা দিয়েছে তো," ওই ব্যাপারটা অলককে খুলে বলতে চায় না অভি। তা ছাড়া, কে বিশ্বাস করবে ওসব?

চুপ করে রইল অলক। ছোটোবেলার বন্ধু ওরা দু'জন। সে জানে যে অভি কিছু লুকাচ্ছে।

"কাল সকাল-সকাল হাজির হব ক্যাম্পাসে। দেখা হচ্ছে?" চায়ের কাপে টানা কয়েকটা চুমুক মেরে বলল অভি।

"নাহ্ দোস্ত, কাল একটা ক্লাস-টেস্ট আছে, সাড়ে বারোটায়। যাব, দিব, চলে আসব, বেশিক্ষণ থাকব না। দুপুরে টিউশানি। দোস্ত, আমার না খুব ভালো লাগতেসে, জানিস, তুই আবার ফিরে যাচ্ছিস। তোকে নিয়ে এমন এমন সব মানুষ কমেন্ট করেছিল... "

"ওসব বাদ দে দোস্ত, ওগুলো কমেন্টে কিছু যায় আসে না!"

"দোস্ত! শরিয়ত নামের ছেলেটাকে মনে আছে? ওর আমাদের ভার্সিটিতে ভরতি-পরীক্ষা দেওয়ারও যোগ্যতা ছিল না। ও তোকে অকর্মা বলেছিল! তা-ও আমারই সামনে।"

মনে মনে হাসল অভি। ভার্সিটি নিয়ে গর্ব! এই জিনিসটা এখনও অলকের মধ্যে বেশ কিছুটা থেকে গেছে।

"দোস্ত, ভার্সিটির মর্যাদা কোনোদিনই ম্যাটার করে না। তোর যোগ্যতা ডিফাইন করবি তুই, তোর ভার্সিটি না। ভার্সিটি শুধু তোকে একটা সার্টিফিকেট দেবে। আর কিছুই না! তুই কোথা থেকে পড়েছিস এটা ব্যাপার না, ব্যাপার হল তুই কী করতে পারিস, তোর মাথার মধ্যে কী আছে!"

"ওসব লেকচার বাদ দে! তুই সহ্য করলেও আমি সহ্য করব না।"

"হে হে হে, আজব ব্যাপার দোস্ত, যে ভার্সিটি বর্তমানে আমাকে-তোকে এবং আমাদের মতো ব্যাচের সাথে বের না হতে পারা কিছু ছাত্রকে আবর্জনা মনে করে সেটার গর্বে আজ তুই অন্যকে ছোটো করছিস।"

"তোকে নিয়ে যে কমেন্ট করল?"

"সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

"ওই বাল নিয়েই থাকো!"

৬

রাতের বেলা আর দরখাস্তটা লেখা হল না অভির। বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে সব কিছু গুছিয়ে উঠতে উঠতেই দুটো বেজে গেল। ওর আম্মু দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে উঠেই দরখাস্ত লিখবে ঠিক করল ও।

রাতে ঘুমানোর আগে শেষবারের মতো নেটে বসল অভি। আজ শুক্রবার। প্রতি শুক্রবার রাতে ঘুমানোর আগে একবার করে অদিতির প্রোফাইল দেখে সে। গত এক-দেড় বছরে ব্যাপারটা রুটিনের মতো হয়ে গেছে। অদিতি এখনও ওকে আনফ্রেন্ড করেনি। লিস্টে রেখে দিয়েছে। কেন যে রেখেছে সেই ব্যাপারে কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না অভি।

অদিতির প্রোফাইলের পোস্টগুলো আজকাল কেমন যেন অদ্ভুত হয়। একটু বেশিই অদ্ভুত আর কী! বুদ্ধিমান যে কেউ পোস্টগুলো দেখে বলতে পারে যে মেয়েটার জীবনে কিছু একটা চলছে, বিশেষ কিছু।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেসবুক থেকে বেরিয়ে এল অভি। এখন কম্পিউটার অফ করে ঘুমিয়ে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু আজ সারাদিনে দু'বার ওর সাথে কী হল এটা? রাস্তা ফাঁকা, কেউ নেই! রক্ত! ক্যাম্পাসে ফিরে যাওয়া নিয়ে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছে, তাই এমন হচ্ছে? হ্যালুসিনেশন? একই দিনে দু'বার হ্যালুসিনেশন হবে? আর তা ছাড়া হ্যালুসিনেশনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ নতুন কিছু দেখে না। যা দেখে তা সম্পর্কে আগে থেকেই তাদের ধারণা থেকে থাকে, কিংবা মনের অন্ধকার কোনো কল্পনাও উঠে আসে এতে।

ওই ব্যাপারটা কি হ্যালুসিনেশন ছিল? ফাঁকা শহর! এমন কিছু কখনোই তো কল্পনা করেনি সে। আবার কে জানে? হয়তো ওর অবচেতন মন কোনো এক সময়ে এমনই এক শহর কল্পনা করেছে? অত্যধিক মানসিক চাপের ফলে তা হ্যালুসিনেশন হয়ে উঠে এসেছে ওর চোখের সামনে?

না, এত তাড়াতাড়ি ঘুমানো যাবে না। নেটে আর একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। কী নিয়ে করা যায়? গতরাতে পড়া ওই এলাইজা নামের ক্রিপিপাস্তাটা নিয়েই একটু ঘেঁটে দেখা যাক।

***

দেখতে দেখতে রাত তিনটা বেজে গেল। এলাইজা ক্রিপিপাস্তাটা আসলেই বিতর্কিত। শুধু সারফেস ওয়েব কিংবা ক্রিপিপাস্তা ফোরামেই নয়, ডিপ ওয়েবে পর্যন্ত এটা নিয়ে অনেক আলোচনা চলে।

কেউ বলে এটা কোনো উন্মাদের লেখা, তো কেউ বলে এলাইজা ক্রিপিপাস্তাটা আসলেই সত্যি। ১৯৯৭ সালে এমনটা আসলেই হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে ডিপ ওয়েবে সবচেয়ে প্রচলিত মতামত হল ওই ঘটনাতে মৃতদের সবাইকে একটি রেড রুম বা লাল ঘরে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছিল।

ভাবতে লাগল অভি। রেড রুম বা লাল ঘর। ডিপ ওয়েবের খুবই রহস্যময় একটি নাম। অনেকে তো এটাকে ডিপ ওয়েবের আরবান লেজেন্ডও বলে থাকে।

রেড রুম বা লাল ঘর হল এমন এক জায়গা, যেখানে সরাসরি মানুষ খুন করা সম্প্রচার করা হয়! প্রথমে নাকি একটা মানুষকে এনে বেঁধে রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে ভিডিয়ো শুরু হয়, তাদের বিশেষ ওয়েবসাইট সরাসরি তা সম্প্রচার করতে থাকে। ধীরে ধীরে দর্শকেরা আসতে থাকে। সব দর্শক আসার পর শুরু হয় 'শো'। প্রবেশ করে উপস্থাপক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপস্থাপকেরা নাকি মুখোশধারী হয়ে থাকে। দর্শকেরা সরাসরি নানান কমেন্ট করতে থাকে। ওরা যেভাবে কমেন্ট করে ঠিক সেভাবেই বন্দিকে নির্যাতন করে উপস্থাপক। একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিটি দর্শকই কমেন্ট করার সুযোগ পায়।